ভাঙা না-গড়া

৬৭-৬৮ সালে আমরা তখনও ছাত্রছাত্রী। স্বপ্ন দেখছি দেশের জন্য দেশের মানুষের জন্য খুব বড় কিছু করবার। সবে বড় হয়ে উঠতে চারপাশে যে সমাজকে দেখছি তা নিষ্ঠুর, স্বার্থপর এবং মিথ্যাপূর্ণ। ঘা খেয়ে বারেবারে বুঝছি সমাজের বড়রা যা আমাদের বলেছেন তা নিজেরা বিশ্বাস করেননি, যা নিজেরা করেছেন তা বলেননি, এমনকি, তাঁদের বলা কথা আমরা যখন বিশ্বাসে পালন করতে গেছি তখন বাধা পেয়েছি তাঁদেরই কাছ থেকে। 'জানো তো জর্জ ওয়াশিংটন একবার ছোটবেলায় কুড়ুল দিয়ে—' থেকে আরম্ভ করে।

আর তখনই, নতুন ভাবনাচিন্তার ঝড়ের বাতাসে এক-এক করে ভেঙে পড়ছে প্রাচীর। বিধিনিষেধের। বিচারবিহীন বাধ্যতার। 'সব কিছুকেই প্রশ্ন করো' এই ভাবনা সামনে উড়ছে পতাকার মতো। সেই সঙ্গে গড়ে উঠতে থাকা চিন্তার ওপর আছড়ে পড়ছে ঢেউ—'মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ধ্যানধারণা হচ্ছে এক ক্ষয়িষ্ণুশ্রেণীর ধ্যানধারণা। তা বিপ্লবকে পিছিয়ে দেয়। মধ্যবিত্তের সমস্ত মূল্যবোধকে বিচার কর শ্রেণীসংগ্রামের কষ্টিপাথরে, কৃষকশ্রমিকের লড়াইয়ের মাপকাঠি দিয়ে। পুরনো যে সব ব্যক্তিত্বকে আমাদের সামনে সাজিয়ে রাখা হয়েছে তারা শাসক ব্রিটিশরাজের পেটোয়া ছিল বলেই সামনে আসতে পেরেছে। মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরা হচ্ছে আসলে শ্রমিক-কৃষকের রক্তে পালিত এক পরজীবী শ্রেণী। এদের মূর্তি ভেঙে ফেলে দেওয়ার মধ্য দিয়েই পুরনো পচা সমাজের বিরুদ্ধে আমরা প্রথম আঘাত হানব। এইসব মূর্তি যাদের তারা কেউ ভারতের শ্রমিক-কৃষকের বন্ধু ছিল না। ভারতের শ্রমিক-কৃষকের তরফ থেকে নতুন ইতিহাস লেখা আরম্ভ হবে। পুরনো প্রতীককে আঘাত করাই তার প্রথম ধাপ। এইসব যুক্তি ও আবেগের মধ্য দিয়ে চিন্তা গড়ে ওঠে মূর্তিভাঙার স্বপক্ষে। যখন প্রশ্ন উঠল বিদ্যাসাগরের, বিশেষ করে বিদ্যাসাগরের, তখন মনের মধ্যে ক্ষণিক দ্বিধা এসেছিল। কেন বিদ্যাসাগরও? বিদ্যাসাগর তো ভালবাসতেন নিজের গ্রামের মানুষদের? সব দুঃখী অসহায় মানুষদের? তিনি তো চেয়েছিলেন মানুষকে শিক্ষিত করতে? কোনো ধার্মিকবাণী প্রচার না করা বিদ্যাজীবন এই লোকটি সম্পর্কে মনের মধ্যে কোথাও যেন এক ব্যক্তিগত ভালবাসা ছিল।

কিন্তু সেক্ষেত্রেও যুক্তি ছিল যথেষ্ট—ভালবাসতেন গ্রামের মানুষদের? ভালবাসা বলে ওকে? ও হচ্ছে গরিব লোকদের প্রতি 'ভদ্রলোক'দের করুণাময় কম্বল বিতরণ। বিদ্যাসাগর যে 'দুঃখী অসহায়দের জন্য' সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলবার চেষ্টা করেছিলেন তারাও মধ্যবিত্তশ্রেণীরই লোকজন। বাঙালি ছেলেদের শিক্ষিত করবার চেষ্টা তো ইংরেজের অফিসে কেরানি সরবরাহ করবার জন্য। বিদ্যাসাগরের জনদ্রোহিতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ—সিপাহীবিদ্রোহ দমনের জন্য যে ব্রিটিশ-অধীন সেনাবাহিনী আসে

তাদের অন্যতম আবাস হয়েছিল সংস্কৃত কলেজের বাড়ি, যে কলেজে বিদ্যাসাগর তখন প্রিন্সিপাল।

এইসব যুক্তি ছাড়াও সেই বিশেষ মূর্তিভাঙা বা অন্য কাজ সমর্থনের ক্ষেত্রে অন্য আরেকটা মানসিক কারণও ছিল, আজ যে কথা সমস্ত লজ্জা সত্ত্বেও স্বীকার করে নিতেই হবে, সেই কারণটি ব্যক্তিগত ভীরুতা। আমি জানি না, সেই সংকটে কি আমি একাই ছিলাম? সংগঠনের প্রতি, নেতৃত্বের প্রতি ভালবাসায়-আগ্রহে আমি জোরের সঙ্গে প্রশ্ন তুলতে ভয় পেয়েছি। পাছে আমার দ্বিধা মধ্যবিত্তের স্বাভাবিক ভীতু শ্রেণীচরিত্র হয়! এইসব ব্যক্তিগত ভালবাসা, ব্যক্তিগত দ্বিধা বা প্রশ্ন যদি বিপ্লববিমুখীনতার সূচক হয়!

তারপর দিন পার হয়েছে অনেক। ভেঙেছে আরও অনেক কিছু। ভিতরে এবং বাইরেও। আজও আমি মনে করি না মূলগতভাবে কোনো ভুল করেছিলাম আমরা। নিজেদের ছোটছোট স্বার্থবৃত্তকে না ভাঙলে কোনো আদর্শের দিকে যেতে পারে না মানুষ। নিজেদের ছোটছোট ব্যক্তিপরিচয়কে মানবজাতির প্রেক্ষাপটে স্থিত করে দেখতে না পারলে বোধ করা যায় না ইতিহাসের চলমান ধারাকে। আর, কোনো লোভ, স্বার্থচিন্তা ফাঁকি দেবার ইচ্ছা ছিল না। সেই কয়েকসহস্র সাহসী ছেলেমেয়ের মধ্যে যারা মানুষকে ভালবেসে, পৃথিবীকে মানুষের বাসযোগ্য করে যাবার শপথ নিয়ে এগিয়েছিল।

আজ যখন সেদিনের লড়াইয়ের ধরন কিংবা ধ্যানধারণা থেকে প্রায় কুড়ি বছরের দূরত্বে এসে দাঁড়িয়েছি তখন স্বভাবতই সেই আন্দোলনকে, বিক্ষোভের সেইসব প্রকাশকে দেখতে পাই আরও অনেক বড় প্রেক্ষাপটে, আরও অভিজ্ঞতা ও পরিণত চিন্তার আলোতে। এখানে আজ আর আমি যুক্ত নই কোনো সংঘে, হয়ত এসব আমার ব্যক্তিগত চিন্তা। যে জীবনের মধ্য দিয়ে পেরিয়ে এসেছি, পেরিয়ে চলেছি যাকে, তাকে আমার নিজের মতো করে বোঝা। সেখানে মনে হয়েছে প্রত্যেক দেশেরই থাকে নিজস্ব ইতিহাস, তার বেড়ে উঠবার, গড়ে উঠবার নিজস্ব ধরন। উৎপাদন উপাদানের লভ্যতা, ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক বিশিষ্টতা সহ আরও বহু জিনিসের মিশ্র জটিল ক্রমপরিণতিই এক একটি দেশের ইতিহাসকে, সমাজ-কাঠামোকে গঠন করে। বাস্তবকে স্বীকার করে নিলে তাই দেখব প্রতিটি দেশের ইতিহাসই আলাদা-আলাদা। আলাদা উৎপাদন কাঠামো, আলাদা সামাজিক বুনন, রীতিনীতি আচার সংস্কৃতি—সব। তাই কোনো একদেশের সমাজ বা রাষ্ট্রকাঠামো পরিবর্তনের কার্যক্রম অন্য দেশে টায়টায় বসে যাবে না। আমাদের সমাজকে পরিবর্তিত করতে হলে আমাদের নিজেদেরই মেধা, চিন্তাশক্তি ও পরিশ্রম প্রয়োগ করে নিজেদের দেশের বাস্তব ইতিহাসকে যথসাধ্য প্রামাণ্য নিরপেক্ষ ও সংস্কারমুক্তভাবে বোঝবার চেষ্টা করতে হবে। যে কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা বা ব্যক্তিত্বকে বিচার করতে হবে তার নিজস্ব সময় ও বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে। দেশের সাধারণ পরিশ্রমী মানুষজন যাঁরা প্রকৃতপক্ষে দেশের ইতিহাসকে গঠন ও বহন করেন, তাঁদের কাছ থেকে শেখবার জন্য সত্যিকারের

আগ্রহ ও সজাগতা থাকতে হবে। আগে আমরা ভাবতাম অন্তত আমার কাছে সেরকমই প্রতিভাত হয়েছিল, যে আমাদের দায়িত্ব সাধারণ মানুষদের শেখানো বা বোঝানো। আজ ভারতবর্ষের বিভিন্ন গণআন্দোলনের কাছ থেকে দেখে আমার আরও দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যাঁদের আমরা জনসাধারণ বলি তাঁরা নিজেদের সমস্যা ও তার উৎসগুলিকে প্রায়ই সঠিকভাবে জানেন। যদি কোনো বস্তু, সংগঠন বা ব্যক্তিকে ক্ষতিকারক বা জনবিরোধী বলে চিহ্নিত করার প্রয়োজন হয়, অধিকাংশ মানুষের চিন্তা ও সমস্যাকেই সেক্ষেত্রে গুরুত্ব দিতে হবে। আমরা যারা সচেতনে নিজেদের 'মধ্যবিত্তমানসিকতা'কে উপহাস করি অথচ মনের ভেতরে-ভেতরে নিজেদের চিন্তা ও বিচারকে প্রাধান্য দিই, তাদের ভাবনাকে নয়। বিধিলিঙে কথা বলবার অসুবিধা এই, সহজেই সরল বাক্যকে ডকট্রিনেশান মনে হতে পারে। যে সব কথা বলছি তা কোনো অনুশাসন নয়, আমার নিজের ভাবনার মধ্যে সমস্যাসমূহের ভাঙাগড়া এরকম চেহারা নিয়ে এসেছে। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, বিদ্যাসাগর, হোসেন শাহ বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, উইলিয়ম কেরি বা পঞ্চানন কর্মকার —এঁরা দেশের ইতিহাসের অংশ। কোনো ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন করবার সময়ে তাঁর কাল, সে কালের সামাজিক অবস্থা ও সীমাবদ্ধতার প্রতি নজর রাখতে হয়, একথা সকলেই জানেন।

মূর্তিভাঙার আন্দোলন ছিল মধ্যবিত্ত মূল্যবোধের বিরুদ্ধে এক প্রতীকী আন্দোলন এবং তা ছিল সম্পূর্ণ মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরই ধরনে। অন্যায় ছিল না সেই মূল চিন্তায়। প্রশ্ন তোলা জরুরি ছিল, স্থিতাবস্থা ভাঙবার জন্য জোরে ধাক্কা দেওয়া জরুরি ছিল। এমনকি জোর আঘাত না এলে একথাও জানা যায় না কোনো বস্তুর সত্যতা বা স্থায়িত্ব প্রকৃতই ঘাতসহ। আমাদের সমাজে মধ্যবিত্তশ্রেণীর উপস্থিতি এক বাস্তব সত্য এবং আমাদের মতো দেশে যেখানে খুব কম মানুষই শিক্ষার সুযোগ পান, সেখানে সুস্থ চিন্তা অর্জন ও প্রচারের জন্য মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। যদি তার জন্য সচেতনভাবে চেষ্টা করা হয়। আজ আমার মনে হয় বিশেষ কোনো মূর্তি ভেঙে ফেলবার মতো প্রতীকী কাজের চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর হবে বোধহয় বিভিন্ন সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক বিষয় নিয়ে প্রশ্ন ও বিতর্ক তোলা। নানাস্তরের যত বেশি সম্ভব মানুষকে জড়ানো হোক সেই বিতর্কে। এইসব বিতর্ককে যদি সত্যই খোলাখুলি ও ব্যাপক করে তোলা যায় তাহলে কমে যাবে মূর্তি গড়ার প্রয়োজনীয়তা।

জয়া মিত্র